PG-PS-1

প্রশ্ন. জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি ব্যাখ্যা করো ?

Answer - **ভূমিকা:-**বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় তাঁর রচনার দিক থেকে একজন অটল ছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের জাতীয়তাবাদের অন্যতম পথিকৃৎ এবং একজন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী। উপন্যাস, প্রবন্ধ ও প্রবন্ধের আকারে তাঁর গদ্য লেখা প্রকাশের আগে জাতীয়তাবাদ কোনও ভারতীয় ঘটনা ছিল না। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এটি পশ্চিম থেকে আমদানি করা হয়েছিল। এই ধরনের ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয়দের উপযোগিতাবাদ এবং ফরাসি বিপ্লবের মতাদর্শের উন্মোচন করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা উপযোগিতাবাদের বৈশিষ্ট্য এবং ফরাসি বিপ্লবের মতাদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি মনে করতেন, ইউরোপের মতো ভারতের উত্থান কেবল জাতীয়তাবাদের সাহায্যেই সম্ভব হবে। তিনি ভাল করেই অবগত ছিলেন যে ইংরেজি শিক্ষার যৌক্তিক উপাদান, যা জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি, শুধুমাত্র হিন্দু সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে না। জাতীয়তাবাদের ইউরোপীয় ধারণা এবং জাতীয়তাবাদের ভারতীয় ধারণার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের ধারণা সকলের কল্যাণের জন্য ভালবাসার আদর্শের উপর ভিত্তি করে। তার জাতীয়তাবাদের ধারণা তার বিপ্লবী উপন্যাস *আনন্দমঠে*রূপ নেয় । সেই উপন্যাসে ব্যবহৃত উপন্যাস এবং গান *বন্দেমাতরম*উভয়ই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

উনিশ শতকের ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে তৎকালীন দেশাত্মবোধক ও স্বদেশ প্রেম মূলক সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পাশাপাশি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী ছবিগুলিও ভারতীয় জাতীয়তা বোধের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা করে। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের লেখায় ও রেখায় ভারতীয় জাতীয়তাবোধের এক বিশাল বিকাশ সংঘটিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "আনন্দমঠ", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গোঁড়া", স্বামী বিবেকানন্দের "বর্তমান ভারত" এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতমাতা চিত্র গুরুত্বঅপরিসীম।

"আনন্দমঠ"এর অবদান:-বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ প্রগাঢ় ও প্রভাব ফেলেছিল জাতীয়তাবাদীদের ওপর । আনন্দমঠ এর সন্তানদের উচ্চারিত বন্দেমাতরাম মন্ত্র দেশবাসীকো মুক্তি আন্দোলনে আন্দোলিত করে। এই গ্রন্থে দেশমাতৃকার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত মূর্তিগুলি তুলে ধরেন বঙ্কিমচন্দ্র। "মা যা হইয়াছেন"- দশ জননীর এই মূর্তি হৃতসর্বস্ব নগ্নিকা দেশ এর মূর্তি। এই মূর্তির মাধ্যমে শোষণ মুক্তা, কল্যাণী, জগদ্ধাত্রী দেশমাতৃকার মূর্তিকে তুলে ধরেছেন । আনন্দমঠ এর সন্তানদের আদর্শ ভারতের শিক্ষিত যুব সমাজকে বিশেষ করে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের একাংশকে অনুপ্রাণিত করে। সন্তানদের উদ্দেশ্যে সত্যানন্দ এর আহবাণ এর মধ্যে তিনি আসুরিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ধর্মান্ধতা জাগানোর ডাক শুনেছেন। অসুরবিনাশিনী দেবী দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠে ছিল অরবিন্দের স্বপ্নের দেশ মাতৃকার মূর্তি। আনন্দমঠ উপন্যাসটি সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রচারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এই গ্রন্থে তিনি একদল দেশপ্রেমিকের আত্ম উৎসর্গের কথা তুলে ধরেছেন। স্বাদেশিকতা প্রসারে বন্দেমাতরম সংগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগীতের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র ভারত জননীর বাস্তব রূপ অংকন করেন এবং পরবর্তীকালে এই সংগীত ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের উপর রূপ ধ্বনিতে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি স্বদেশ প্রেমিকের মুখে মুখে উচ্চারিত হয় এই বন্দেমাতরম ধ্বনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনার শুরুতেই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত জাতি বিষয়ক ধারণা। তিনি যে জাতির বিষয়ে কথা বলেছেন সেটির কৌমগত, ভৌগোলিক ও সামাজিক উপাদানের ব্যাপারে ধোঁয়াশা আছে। কখনও কখনও তিনি 'ভারতীয়' শব্দটি যে অর্থে আমরা শব্দটি বর্তমানে ব্যবহার করি, সেই অর্থে ব্যবহার করেননি। তাঁর বিচারে 'ভারতীয়'র পরিধিতে কেবল 'বাঙালি' ও 'হিন্দু'ও কখনও কখনও ঢুকে পড়েছে।

এই পরিধির ব্যাপ্তির বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুদীপ্ত কবিরাজ তাঁর 'দ্য আনহ্যাপি কনশাসনেস' গ্রন্থে (প্রকাশক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস) লিখেছেন, যে এটাই হল কল্পনাপ্রসূত ইতিহাস (imaginary history) লেখার সুবিধা। ধ্যানধারণাগত অনির্ণেয়তা (Conceptual indeterminacy)-র বালাই সেখানে নেই। সুদীপ্ত কবিরাজ লিখেছেন, "Such writers use fuzziness of the community to give their audience a community which had not existed before, by gradually conceiving a community called the nation." [এ ধরনের লেখকরা কৌম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ধোঁয়াশা বজায় রাখেন যাতে সম্প্রদায়টির অস্তিত্ব সুসংজ্ঞাতভাবে অতীতে না-থাকলেও আস্তে আস্তে জাতির সংজ্ঞাটি অধিগত করে ফেলে।

Pearl coaching center

PG-PS-1

ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন): বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন) গ্রন্থের আদর্শে ও এর নাম অনুসারে বঙ্গের সবথেকে খ্যাতনামা বিপ্লবী সমিতি 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২-এ। অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট বিপ্লবী জীবনতারা হালদার তাঁর *অনুশীলন সমিতির ইতিহাস*গ্রন্থে লিখেছেন যে "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে তাহাই হইল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি।"

বঙ্কিমের ইতিহাস চেতনাঃ বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।" বঙ্কিম বুঝেছিলেন সঠিক ইতিহাস-জ্ঞান একটি জাতির উত্থানের জন্য আবিশ্যিক। আর মিথ্যা, বিকৃত ইতিহাস যে একটি জাতিকে ভিতর থেকে ফাঁপা করে দিতে পারে তাও তিনি বুঝেছিলেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে ইউরোপে যখন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চর্চার শৈশবাবস্থা এবং বঙ্গে যখন ইতিহাসচর্চা প্রায় শুরুই হয়নি বলা যায়, সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাস-লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিম মিনহাজ উস সিরাজের *তবকৎ-ই-নাসিরী*-তে প্রাপ্ত বখতিয়ার খলজীর সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ-বিজয়ের কাহিনিতে কোনদিনই বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন, "সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার॥" তিনি এই ঘটনাকে অসম্ভব বলে মনে করেন এবং বখতিয়ার যে বঙ্গের খুব কম অংশকেই দখল করতে পেরেছিলেন, তাও উল্লেখ করেন। বর্তমানে আমরা জানি যে বঙ্কিমের দাবী ঐতিহাসিকভাবে সত্য। বখতিয়ার শুধু কয়েক বছরের জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবঙ্গের কিছু অংশ দখলে রাখতে পেরেছিলেন। বাকি উভয় বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলই লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন, কেশব সেন-সহ তাঁর উত্তরাধিকারীরা বহু বছর যাবৎ শাসন করেন। *মৃণালিনী*উপন্যাসেও বঙ্কিম বখতিয়ার-সংক্রান্ত কিংবদন্তিটির বিরোধিতা করেছেন॥

বঙ্গদেশের কৃষকঃ বঙ্কিমচন্দ্র নিজ দেশীয় ঐতিহ্য, ধর্ম, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির ওপর জোর দিলেও কিছু বামপন্থী বা অতিবামপন্থী যেভাবে তাঁকে ব্রাহ্মণ্যবাদী, মনুবাদী বা এলিটিস্ট হিসাবে দাগানোর অপচেষ্টা করেন তা কখনই ঠিক নয়। কারণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বর্ণের কথা আমরা তাঁর লেখায় পাই। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক'। এই প্রবন্ধে তিনি বঙ্গের কৃষকদের দুরবস্থার কথা লিখেছেন। তৎকালীন সমাজের অধিকাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তিই যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ- তখন তিনি এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে কলম ধরেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং বাকীরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু। কিন্তু এদের জন্যই বঙ্কিম কলম ধরেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রকাশঃ

উনবিংশ শতকের সাহিত্য জগতের নক্ষত্র ও বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা যে তাঁর সাহিত্য রচনার মাধ্যমেই ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণ ও মুক্তি সংগ্রামকে আলোড়িত করবেন সেটাই কাম্য।বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমযুগের সুচনার সাথে সাথেই ধর্ম, সামাজিক আদর্শ, ও দেশ প্রিতী নতুন রূপে ধরা দিল। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'ভারত-কলঙ্ক' ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তাঁর প্রগাঢ় দেশ প্রীতির নিদর্শন মেলে।মৃণালিনীতে সূচনা হয় স্বাজাত্যবোধের। বিশিষ্ট সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় বলেছেন মৃণালিনীতেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ পূজক রূপে গৈরিক উত্তরিয় পরিধান করে মন্দিরে প্রবেশ করেন। দেশের জন্য উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্রের স্বার্থত্যাগ- তাঁর আত্মোৎসর্গের প্রবল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নবযুগের মহিমান্বিত ঋষির ধ্যানযোগের রুপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশ মাতৃকার পূজায়োজনের সূত্রপাত এখানেই। সে আয়োজনের পুজা সার্থক হয়ে উঠেছে আনন্দমঠে'।মৃণালিনীতে সাধকের কাছে মাতৃপূজার যোগের পন্থা ,নিয়ম, মন্ত্র যেন অস্পষ্ট- সেজন্য সেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে দেশানুরাগের প্রবল উচ্ছ্বাস। অন্যদিকে আনন্দমঠে ঋষি যেন সিদ্ধপুরুষ। আনন্দমঠে দেশপুজা-পদ্ধতী পাশ্চাত্য পদ্ধতীর অনুকরণ নয়- ভারতীয় সংস্কৃতির চিরাচরিত নিষ্কাম স্বদেশ প্রেম।

বঙ্কিম ইংরেজদের চিন্তা ভান্ডার থেকে সংরহ করে আনেন স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠার আইডিয়া।আর সেই আইডিয়াকে সাহিত্যে বাণী মূর্তি দিলেন আনন্দমঠে,দেবীচৌধুরানীতে, কৃষ্ণতত্বে।Ideas rules the world- একথা যদি সত্য হয় তবে এটা স্বীকার্য দেবীচৌধুরানী, আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ব বর্তমান ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করেছে তাঁর কানে ন্যাশনালিজমের মহামন্ত্র শুনিয়ে।তাই বলা যেতেই পারে বিষবৃক্ষ আর কপালকুণ্ডলার বঙ্কিম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা করলেও নব্য ভারতের স্রষ্টার যে গৌরব- সেই গৌরবের দাবী করবে আনন্দমঠ ও কৃষ্ণতত্বের বঙ্কিম। দেশপ্রীতি তাঁর কাছে দেখা শুধু শুকনো কর্তব্য হিসেবে ধরা দেয়নি, স্বদেশ প্রেম তাঁর কাছে ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম। 'ধর্ম্মতত্ত্বে'- লেখা আছে" আরো বুঝিয়াছি,আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম , স্বজন রক্ষা হইতে দেশ রক্ষা গুরুতর ধর্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বালোকে

প্রীতি এক তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।" ঋষিঅরবিন্দের মতে,-" The religion o patriotism-This is the master idea of Bunkim's writing.

ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতিই যে জীবনের পরম ধর্ম- সাহিত্যকে আশ্রয় করে এই বাণী প্রচারে বঙ্কিম আত্মনিয়োগ করেছিলেন কেন? কারণ বঙ্কিম সমস্ত চিত্ত দিয়ে ভালোবেসেছিলেন তাঁর স্বদেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত, অর্ধনগ্ন, মেরুদন্ডহীন নরনারীকে। বাস্তবের হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখেচিত্ত তাঁর অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল-

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বলা হচ্ছে- " জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী "-অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। নবীন বাংলার মন্ত্রগুরু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আমার দুর্গোৎসব'- প্রবন্ধে দেশকে বললেন মা দুর্গা, আহ্বান জানালেন গৃহে ফিরে আসার। তিনি বললেন যে দেশই মা, দেশই স্বরগ,দেশই ধর্ম, দেশইদেবতা ,দেশই হল জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম, প্রাণ, হৃদয় ও শক্তি।দেশ শুধু মা নন তিনি দুর্গতি নাশিনী দুর্গা। তিনি লিখলেন, " যে মনুষ্য 'জননীকে স্বর্গাদপী গরীয়সী' মনে না করতে পারে, সে মনুষ্য, মনুষ্য-মধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপী গরিয়সী' মকনে না করিতে পারে , সে জাতি , জাতি-মধ্যে হতভাগ্য। "

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিয়তাবাদি চেতনার সোনালী ফসল হল 'আনন্দমঠ'। আনন্দমঠের মাধ্যমে বঙ্কিম যে কেবল দেশপ্রেম জাগ্রত করেছিলেন তাই নয়, এই মহা গ্রন্থের মাধ্যমে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন এক নতুন দরশন ও আদর্শবাদ। আনন্দমঠ-এর সন্তান্দলের এক্মাত্র দেবতা হলেন-জননী জন্মভুমি। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতাকে স্থানচ্যুত করে তাঁদের শূন্য আসনে বসানো হয়েছে জননী জন্মভূমিকে। নতুন এই ধর্ম , হিন্দু ধর্ম বা মুসলিম ধর্ম নয়- তা দেশধর্ম । ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন যে, " Bankim chandra converted ptariotism into religion and religion into ptriotism."

প্রশ্ন. জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান বিশ্লেষণ করুন?

Answer - **জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণাঃ**--জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরনের জাতীয়তাবাদী ভাবনা। একদিকে যেমন স্বদেশি চেতনার সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, অন্যদিকে তেমনই ইউরোপীয় জাতীয়তাবোধের অহমিকার মধ্যেও সীমাবদ্ধ ছিল না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বমানবতাবাদের পূজারি। তাই তার জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা ছিল। আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনার আলোয় আলোকিত। জাতীয়তাবাদ বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে চেয়েছিলেন, সেখানে কোনোরকম সংকীর্ণতার স্থান ছিল না।

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের সমালোচনা: রবীন্দ্রনাথ তাঁর'ন্যাশনালিজম' (Nationalism) গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিজের মৌলিক চিন্তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। 1916-17 খ্রিস্টাব্দে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সময় বিভিন্ন জায়গায় তিনি যেসব বক্তৃতা নেন, সেগুলি নিয়েই তাঁর 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ, বিশেষত ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের তাঁর সমালোচনা করেন। পাশ্চাত্যের মাটিতে যে জাতীয়তাবাদের জন্ম, তাকে তিনি ভালো চোখে দেখেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ শুধু ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিরোধ আর বিচ্ছেদের জন্ম দেয়। এই জাতীয়তাবাদ ধর্ম, মানবতাবাদ, নীতিবোধ ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই কারণে পশ্চিমের দেশগুলিতে মারামারি-হানাহানি নিরন্তর ঘটে চলেছে। 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে তাঁর কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। নিজের দেশ, নিজের জাতি বড়ো আর অন্য সব দেশ, অন্য সব জাতি ছোটো ও নীচজাতীয়তাবাদের এই ধারণা যে বিভেদের বীজ বপন করে, তা ক্রমশ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়। শেষ পর্যন্ত তা দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করে সময় বিশ্বে আধিপত্য কায়েমে সচেষ্ট হয়। এজন্য রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমি জাতীয়তাবাদকে আধিপত্যবাদ বা প্রভুত্ববাদ বলে অভিহিত করেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জাতীয়তাবাদ: রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, ইউরোপ তথ্য পশ্চিমের যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি হল জাতীয়তাবাদ। পরাধীন দেশগুলিকে শোষণ করে রিক্ত করে তোলাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার জাতীয়তাবাদ সমগ্র মানবজাতি এবং সমগ্র মানবসভ্যতার পক্ষে এক ভয়াবহ বিপদ। জীবনের অন্তিম লগ্নে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে। মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি ... জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"

জাতি ও জাতীয়তাবাদ : রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জাতি (nation) গঠিত হয়েছে সত্যের জোরে কিন্তু জাতীয়তাবাদ (Nationalism) সত্য নয়। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদ এমন এক ধরনের দুর্বুদ্ধি, যেখানে দেশের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায়। এ এমন এক রিপু যেখানে সকলের দিকে নয়, নিজের দিকেই টান বেশি থাকে।

জাতির চেয়ে মানুষ বড়ো: মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতির চেয়ে মানুষই ছিল বড়ো। তাই তিনি জাতিপূজার কঠোর বিরোধিতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, জাতীয়তাবাদের প্রভাবে মানুষের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়, তাতে মনুষ্যত্বের অবক্ষয় ঘটে। জাতীয়তাবাদী ধারণা ব্যক্তিমানুষকে বলি দেয়। এখানে মানুষের সৃজনশীল সত্তার স্বাধীন বিকাশ ঘটে না। ব্যক্তিমানুষ নেশনের অধীনে যজ্ঞে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদের জাতীয় গরিমার যে আবেগ মানুষের মনে বিভেদের সৃষ্টি করে, তা ক্রমশ মানুষকে দানবে পরিণত করে। মানুষের যাবতীয় শুভ চিন্তা, শুভ চেতনা সব ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে জাতীয়তাবাদ মানবসভ্যতার সংকট ডেকে আনে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ : রবীন্দ্রনাথ সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, পশ্চিমি জাতীয়তাবাদ—পশ্চিমি সভ্যতার এই পথ কখনোই ভারতবর্ষের পথ হতে পারে না। ভারত কখনোই পাশ্চাত্যের ধারণায় 'নেশন' বা 'জাতি' ছিল না। ভারতের 'জাতি' সম্পর্কিত সমস্যা থাকলেও তা রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না, ভারতের সামাজিক ব্যবস্থা তাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। তাই নানা যোদ্ধা জাতি ভারতে এসেছে কিন্তু তারা কেউ ভারতের সমাজব্যবস্থাকে স্পর্শ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত ছিলেন। যে 'নেশন' বা 'ন্যাশনালিজম'-এর উগ্র উন্মাদনার দানবীয় রূপ কখনও ভারতের কাম্য হতে পারবে না। ভারতের কাম্য হল মহোত্তম মানবিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যে উদ্বুদ্ধ এক বিশ্বজনীন আদর্শের দেশ।

মন্তব্য: সমকালীন পৃথিবী যে সময় উগ্র জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদের উদগ্র কামনায় মেতে উঠেছিল, সেসময় রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবজাতির ঐক্যচেতনার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, মানবজাতির আত্মিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাতীয়তাবাদ-সম্পর্কিত ধারণায় নিজের জাতির মধ্যে সকল জাতির এবং সকল জাতির মধ্যে নিজের জাতির সত্য রূপটিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন. উপনিবেশিক ভারতে দলিতআন্দোলনের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন ?

Answer - ভারতের দলিত আন্দোলন 'দলিত' শব্দটি বিশেষা, যার আভিধানিক অর্থ মর্দিত, মাড়ানো হয়েছে এমন অর্থাৎ পদদলিত, পিষ্ট, দমিত এবং নিপীড়িত প্রভৃতি। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে মুসলমানরা ছাড়াও যেসব সামাজিক গোষ্ঠী কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদের অনেকটাই সরিয়ে রেখেছিল, তারা হল অব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য। বিংশ শতকের তিরিশের দশক থেকে অস্পৃশারা নিজেদের দলিত অর্থাৎ নিপীড়িত বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে এদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে বোঝাবার জন্যে দলিত শব্দটি বেশ সুপ্রযুক্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং উপযুক্ত ছিল, ঔপনিবেশিক শব্দ পিছড়েবর্গ বা পশ্চাদপদ শ্রেণীর চেয়ে নিশ্চিতভাবেই ভালো। অন্যদিকে গান্ধিজির দেওয়া হরিজন অর্থাৎ ঈশ্বরের মানুষ' আখ্যাটাও ছিল আপত্তিকর, কারণ এই শব্দের মধ্যে কৃপা ও করুণার পাশাপাশি আছে বর্ণাশ্রম দর্শনের প্রতি রক্ষণশীল মনোভাব। বাসব সরকারের মতে সমাজের নিম্নবর্গের শ্রেণীচেতনায় উদাসীন কিন্তু স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে সজাগ সংগঠিত জঙ্গি অংশের নাম দলিত।

১৯৮১ সালের জনগণনায় ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যা ৭৫ কোটির মধ্যে প্রায় ৩৫ কোটি যে মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী বলে চিহ্নিত হয়েছিল, দলিতরা হল তারই একান্তভাবে গোষ্ঠী সচেতন, সংঘবদ্ধ একটি অংশ। দীনেশ ডাকুয়া মনে করেন, দলিত শব্দটি এসেছে " দলন " থেকে। " দলন " বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো কাউকে গায়ের জোরে বশ মানিয়ে, ওপরে উঠতে না দেওয়া। যেহেতু অতীতে মানুষের দ্বারা মানুষের ওপর আক্রমণ হয়েছে মূলত গোষ্ঠীগতভাবে, সেহেতু দলনকারী এবং পলিত মানুষগুলি অনেক সময়েই ভাগ হয়ে গেছে গোষ্ঠীগতভাবে। ডক্টর অনিলরঞ্জন বিশ্বাস দেখিয়েছেন, " দলিত ' শব্দটি ইংরেজি : depressed'- এর পারিভাষিক প্রতিশব্দ। এর ব্যবহার সম্পর্কে ১৯৩১ সালের আদমশুমারির বঙ্গ এবং অসমের অধ্যক্ষ এ. ঈ. পোর্টার তাঁর পরিশিষ্ট অংশে বলেছেন যে ইউরোপে ঐ শব্দে বোঝায় চিরকালিক দরিদ্র জনগণকে। এছাড়া এই শব্দটি খারাপ আর্থিক অবস্থার দ্যোতক।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেআন্দোলন দলিত প্রসঙ্গ নিয়ে যে আলোচনার ব্যবস্থা করেছিল সেখানে সকল বক্তাই " দলিত ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি এবং অর্থনির্ণয় প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য রাখেন এবং নিপীড়িত অবহেলিত শূদ্র ও অন্ত্যবর্ণের মানবগোষ্ঠীকেই উক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ রূপে প্রতিপাদন করেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের সব বর্ণের স্ত্রীলোকই নানাভাবে অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় দলিত মানবগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত বলে অধিকাংশ বক্তাই

Pearl coaching center

মন্তব্য করেন। Untouchability and Stratification in Indian Civilisation নামক প্রবন্ধে Shrirama দলিতদের সঙ্গে অস্পৃশ্যতার ধারণাটি জড়িত বলে দেখিয়েছেন।

বিংশ শতকের তিরিশের দশকে দলিত সম্প্রদায়ের জনগণ নিজেরা ঐ নামের পরিবর্তন চেয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁদের নতুন নামকরণ হয় তপশিলি জাতি ' এবং ' তপশিলি উপজাতি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতে যে সংবিধান চালু হয়েছে, তাতে ১৯৩৫ সালের অভিধা গ্রহণ করা হয়েছে। আজও সরকারি ভাষ্যে দলিতরা তপশিলভুক্ত জাতি বা উপজাতি বলে উল্লিখিত হয়। যদিও তপশিলি সমাজের সব অংশ দলিত পর্যায়ভুক্ত নয়। দলিত' মূলত হিন্দুদের বিষয় হলেও মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ভুক্তদের মধ্যেও এই পর্যায়ের মানুষ দেখা যায়। যাঁরা দলিত শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী তাঁরা যুক্তি দেখান যে শব্দটি আন্দোলনের হাতিয়ার বিশেষ। লতা মুরুণকার মনে করেন, নানাভাবে চলত নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্যদের ওপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। দারিদ্র্য ও দুঃখে এদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। উনিশ শতকের শেষার্ধে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে জ্যোতিরাও ফুলের নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে বর্ণপ্রথাবিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। ফুলের জীবনীকার শ্রী ধনঞ্জয় কীয়ের ফুলেকে মহারাষ্ট্রের সমাজ বিপ্লবের পিতা' বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত ফুলে ছিলেন আধুনিক ভারতের প্রথম ব্যক্তি যিনি সমাজের তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের অর্থাৎ দলিতদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস জুগিয়েছিলেন। উনিশ শতকে যখন অধিকাংশ সমাজসংস্কার আন্দোলন মূলত শহরকেন্দ্রিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠেছিল তখন ফুলে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যশোধক আন্দোলন ছিল গ্রামাঞ্চলভিত্তিক। মুকুন্দরাও পাটিলের নেতৃত্বে এই আন্দোলন ফুলের মৃত্যুর পরেও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে।

মহারাষ্ট্রে অব্রাহ্মণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের শেষে দুটি সমান্তরাল ধারা দেখা যায় বলে গেইল ওমভেট মনে করেন। একটি ধারা ছিল রক্ষণশীল, গোঁড়া, যার পরিচালনায় ছিল অপেক্ষাকৃত ধনী ব্রাহ্মণরা অপরটি প্রগতিবাদী ধারা যার প্রতিনিধিত্ব করত সত্যশোধক সমাজ। পরিচালনায় ছিল অপেক্ষাকৃত ধনী ব্রাহ্মণরা। অপরটি প্রগতিবাদী ধারা, যার প্রতিনিধিত্ব করত সত্যশোধক সমাজ। দক্ষিণ ভারতে দলিতদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন কেরলের শ্রীনারায়ণ । তাঁর সামাজিক আন্দোলনের বিশেষ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকলেও পরবর্তীকালে কেরালায় গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে তা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা মাদ্রাজের দিকে তাকালে দেখি মাদ্রাজের অন্ত্যজরা ব্রাহ্মণ বিরোধিতায় যতখানি না এগিয়ে এসেছিল তার থেকে অনেক বেশি এগিয়ে এসেছিল অব্রাহ্মণ জাতগোষ্ঠীর উচ্চশিক্ষিত এবং সম্পদশালী সম্প্রদায়। এমতাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ভারতে যিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে একাধারে জাতীয় আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনকে একটি মূল ধারায় মেলাতে চেয়েছিলেন তাঁর নাম ই. ভি... রামস্বামী নায়কার। যিনি ১৯২৫ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মণতন্ত্র এবং কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত " আত্মমর্যাদা " আন্দোলন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াই বিয়ে থেকে শুরু করে মন্দিরে জবরদস্তি প্রবেশ, মনুস্মৃতি পোড়ানো ও কখনও কখনও পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদ পর্যন্ত এগিয়েছে। এম. এস. এস পণ্ডিয়ান দেখিয়েছেন আত্মসম্মান আন্দোলন অনেক প্রত্যাশাপূর্ণ এক সমৃদ্ধিশালী সমাজের ধারণা উপস্থিত করেছিল, যে সমাজে থাকবে না কোনো জাতিগত প্রাধান্য, অস্পৃশ্যতা বা লিঙ্গ বৈষম্য। আম্বেদকার (১৮৯১-১৯৫৬) মহারাষ্ট্রের মাহার নামের অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত পরিবারে জন্মেছিলেন। তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন অস্পৃশ্যদের কতটা অপমান, উদ্বেগ, হতাশা এবং অবজ্ঞার অভিশাপ ভোগ করতে হয়। ১৯২০ - র দশক থেকে অস্পৃশ্য মাহাররা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন আম্বেদকারের নেতৃত্বে। তাদের দাবির মধ্যে ছিল পৃথক প্রতিনিধিত্ব পুকুর ব্যবহার ও মন্দিরে ঢোকার অধিকার আর মাহারওয়াতন অর্থাৎ গ্রামের মোড়লদের জন্যে প্রথাগত বিভিন্ন সেবাকর্মের বিলোপ।

১৯২৭ সাল নাগাদ প্রথম মাহার রাজনৈতিক সম্মেলনের সময়েই হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে বিচ্ছেদের প্রতীক হিসেবে ॥ মনুস্মৃতি ' পোড়াতে শুরু করেন আম্বেদকারের কিছু অনুগামী। কংগ্রেস ১৯৩১ সালে করাচি অধিবেশনে সব নাগরিকদের জন্যে সমান অধিকার দাবি করেছিল। দলিতদের প্রতিনিধি হিসেবে আম্বেদকার গোলটেবিল বৈঠকে যান। সেখানে গান্ধির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। সরকার দলিতদের জন্যে পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর ব্যবস্থা করলে গান্ধি অনশন করেন, ১৯৩২ সালে আম্বেদকার গান্ধীর সঙ্গে পুনা চুক্তি করে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলের ব্যবস্থা মেনে নেন 78 টি আসনের স্থলে গান্ধী এই শ্রেণীর জন্য ১৯১ টি আসনের ব্যবস্থা করেন পজেসি মন্ত্রিসভা গুলো বড় ধরনের সামাজিক সংস্কার চালু কআম্বেদকারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত একটি চিঠির ভিত্তিতে ১৯৫৭ সালে রিপাবলিকান পার্টি গড়ে ওঠে। ঐ বছরেই বোম্বাই বিধানসভা নির্বাচনে তারা প্রার্থী দেয় ও কয়েকটি আসনে জয়লাভ করে। তবে দলের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং অন্য কোনও কারণবশত ঐ পার্টি অচিরে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই দলের বেশিরভাগ লোকই কয়েক বছরের মধ্যে কংগ্রেসে যোগ দেয় বা তার সঙ্গে জোট বাঁধে। ওয়াই. ভি. চহ্বান – এর নেতৃত্বে কংগ্রেস তাদের সাগ্রহে স্থান দেয়। ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিকে আমূল সংস্কারবাদী আন্দোলনের জোয়ার আসে দেশব্যাপী। তারই অঙ্গ হিসাবে মহারাষ্ট্রে দলিত প্যান্থার্স